পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রবন্ধের গতিবিধি ঃ সমস্যা ও প্রতিকার

আজহারউদ্দীন খান্

সাহিত্যের একটি গুত্বপূর্ণ বিভাগ হচ্ছে প্রবন্ধ। প্রবন্ধ একটা জাতির মানসিক উৎকর্ষ নিরূপনের মাপকাঠি।জাতির মননশীলতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রবন্ধই বহন করে। একটা জাতি শুধু আবেগ অনুভূতি কল্পনা নিয়েই বেঁচে তাকতে পারেনা --- জাতীয় জীবনকে একটা শক্ত জমির ওপর দাঁড় করানোর জন্য বিচার যুক্তি চিন্তার প্রয়োজন হয়। প্রবন্ধের মৌলিক লক্ষণ হচ্ছে মননশীলতা। আবেগ কল্পনা অনুভূতির সঙ্গে যদি মননশীলতার মিশ্রণ না থাকে তাহলে কোন সাহিত্যই সাহিত্য হবে না। রাজশেখর বসু (১৯৮০-১৯৬০) একরার হিশেব করে দেখিয়েছিলেন ---প্রতিবছর বাংলা ভাষায় যা সাহিত্য রচিত হয় তার সত্তর ভাগ গল্প উপন্যাস ভ্রমনকাহিনী বাকী তিরিশভাগ রকমারি রচনা তার মধ্যে প্রবন্ধের স্থান সর্বনিম্নে। তাঁর প্রদত্ত সমীক্ষায় আজ চল্লিশ বছর পরও কোন হেরফের হয়নি বরং বলা যায় প্রবন্ধের মান প্রচার ও প্রসার আরও সঙ্কুচিত হয়েছে। তাছাড়া অখন্ড ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশও কমে এসেছে। প্রবন্ধ গ্রন্থর নামে যা বেচেছে তা অধিকাংশ সাময়িক পত্রের চাহিদা মেটানো খুচরো লেখার সমষ্টি সামগ্রিক কোন ধারণা উৎপাদনে সহায়তা করে না। বাজরিয়া কাগজে গল্প উপন্যাসই কার্যত বেশী থাকে, প্রবন্ধ থাকে না বললেই চলে। লিটিল ম্যাগাজিন গুলোয় প্রবন্ধ থাকে কিন্তু তার প্রচার খুবই সীমিত। ফলে বৃহত্তর পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনা। লিটল ম্যাগাজিনও ব্যাঙার ছাতার মত বেরোয়। চার-পাঁচ জন মিলিত হয়ে সখের বশে কাগজ বের করে থাকেন -- বুদবুদের মত উঠে বুদবুদের মত মিলিয়ে যায়। কিছু লিটিল ম্যাগ টিকে থাকে কিন্তু তাদের প্রবন্ধ জোগড় করতে কালঘাম ছুটে যায়। সিরিয়াস বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মত মানসিকতা আমরা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছি। গল্প উপন্যাস কবিতা পৃথিবীতে অনেক লেখা হয়েছে--- গল্পকার, ঔপন্যাসি কবি অনেক, সে তুলনায় সার্থক প্রবন্ধকার সংখ্যায় খুবই কম।

ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ যা লেখা হয় তার অধিকাংশ একাডেমিক এবং এই একাডেমিক প্রবন্ধ দুধরনের ---এক, সোজাসুজি ছাত্রছাত্রীদের দিকে চোখ রেখে প্রবন্ধ লেখা হয়, দুই, ফুটনোট উদ্ধৃতি কন্টকিত তথাকথিত গবেষণার নামে ছকে বাঁধা ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য প্রবন্ধ রচনা করা। এই দুই ধরণের প্রবন্ধ অধ্যাপকরাই লিখে থাকেন আর প্রবন্ধের যদি বাজার থাকে তাহলে তাঁরাই দখল করে আছেন প্রবন্ধ সাধারণত একাডেমিক হওয়ার দণ ছাত্রছাত্রীরাই পরীক্ষায় উত্তরদানের প্রয়োজনেই এসব বইয়ের পাঠক ও ক্রেতা হয়। এর বাইরে যেসব নন-একাডেমিক কিংবা সাহিত্য বহির্ভূত অর্থাৎ সিলেবাস বহির্ভূত প্রবন্ধাদি বেরোয় তার পাঠক তাঁরা নন, কিছু বিদগ্ধ শ্রেণীর পাঠক আছেন যাঁরা পড়ে থাকেন তবে তার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প । সেজন্য এজাতীয় প্রবন্ধের বই দীর্ঘদিন ধরে বিক্রি হতে থাকে,পোকাতে কাটে, সবশেষে বইবাজারে উচচহারে কমিশন দিয়ে গুদামঘর সাফ করা হয়। এজাতীয় বই সাধারণত লেখককে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করেই

বের করতে হয় আর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডিগ্রী প্রাপ্ত থিসিসের বই অধিকাংশ অমুদ্রিত অবস্থায় পড়ে থাকে। তবে বিড়ালের ভাগ্য শিকে ছিঁড়ে তাহলে দু-একটা প্রকাশক নিজস্ব প্রকাশনীর আভিজাত্য রক্ষা ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কিংবা ভিন্ন দিক দিয়ে অন্য কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দু-একজনের বই প্রকাশ করে থাকেন। নন- একাডেমিক বাংলা প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রকাশকও দু-একটি ---গণনের জন্য আঙুলেরও দরকার হয় না।

(২) প্রবন্ধের কদর প্রকাশক মহলে কি পাঠকমহলে কি পত্রিকা মহলে নেই বললেই চলে। নির্ভেজাল প্রবন্ধের পত্রিকা বের করার প্রচেষ্টা বার কয়েক হয়েছে কিন্তু সবগুলি পাঠকদের পৃষ্টপোষকতার অভাবে আতুঁড়েই মারা গেছে। কিছু, কিছু, আছে যেমন সাহিত্য ও সংস্কৃতি, প্রমা, অনুষ্টুপ, কোরক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, জিজ্ঞাসা, পরিচয় প্রভৃতি কিন্তু তারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। একযুগ বন্ধ থাকার পর বিশ্বভারতী পত্রিকা বেতে শু করেছিল (নবপর্যায় ১ শ্রাবণ --আশ্বিন ১৪১০) এক বছরও টিকল না। ভাষা নামে একটি ভাষাতত্বচর্চার পত্রিকা ছিল সেটিও পাঁচটি সংখ্যা বেবার পর অবলুপ্ত। সমকালীন নামে একটি প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা বেতো অনেক কষ্টে সৃষ্টি ঘটি বাটি বেচে আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ১০ / ১২ বছর চালিয়েছিলেন সেটাও বন্ধ হয়ে গেলো। চাকলা বিষয়ক পত্রিকা সুন্দরম, মননশীল পত্রিকা সারস্বত প্রকাশ -এর মত পত্রিকার অকালমৃত্যু বেদনাদায়ক ঘটনা। বুদ্ধদের বসুর কবিতা ত্রৈমাসিক পত্রিকা শততম সংখ্যা বের করে পাঠকের অভাবে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। বছর পঁচিশ-ত্রিশ আগেও সংবাদপত্রের শারদ সংখ্যায় একাধিক সিরিয়াস বিষয়ের প্রবন্ধ থাকত। এখন কিছু লিটল ম্যাগাজিন বেরোয়, অনিয়মিত হলেও কিন্তু তার প্রচার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত -- সাধারণ পাঠক তার খবরও পান না। কলকাতায় যত পাঠক আছেন তার দ্বিগুন পাঠক কলকাতার বাইরে আছেন তাঁদের কাছে খবরটা পৌঁছে দেবার মত আর্থিক সামর্থ্য ঐসবলিটল ম্যাগের নেই। এখন সর্বোচ্চ প্রচারিত সংবাদ পত্রের শারদ সংখ্যায় উপন্যাসের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, প্রবন্ধ যা বেরোয় প্রবন্ধের প্রতি কিংবা প্রবন্ধকালের প্রতি সন্মানবশত নয় পত্রিকার ওজন বাড়াবার জন্য নৈবেদ্যের ওপরসন্দেশ রাখার মতো। সিরিয়াস বিষয়ের প্রবন্ধিকারও আর পরিশ্রম করে লিখতে চান না কারণ সম্পাদকরা সেই পাঠশ্রমী লেখা ছাপতে আগ্রহী নন। প্রত্যেক লেখকের মনেই একটা সুপ্ত বাসনা থাকে তার লেখা বহুল পঠিত হোক, বহুল প্রচারিত হোক। বহুল প্রচারিত পত্রিকা কর্তৃপক্ষ আজকাল এমন প্রবন্ধ চান যা মুচমুচে পাঁপড়ভাজা মুখরোচক জাতীয়-- পড়ার পরই যেন সব শেষ হয়ে যায়। এচিত্র আগে ছিল না। সাহিত্যে মানসী ও মর্মবানী, নব্যভারত, ভারতী, প্রবাসী, সবুজপত্র, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, মোহাম্মদী, সওগতা , শনিবারের চিঠি, পূর্বাশা প্রভৃতি পত্রিকার একটা বড় অংশ জুড়ে থাকত প্রবন্ধ তখন লেখকরাও খেটে প্রবন্ধ লিখতেন আর সম্পাদকরাও বহুমান্যভরে প্রবন্ধ ছাপতেন এবং তাতেই লেখক আত্মিক তৃপ্তি পেতেন। সেই চিত্র এখন কোথায়? প্রবন্ধের স্বর্ণযুগ ছিল সেদিন। প্রবন্ধ লেখকরা এখন সাহিত্যের রাজ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। প্রাবন্ধের এই অনাদরে ভাল প্রবন্ধিকও আজ তেমন দেখা যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা যায় সেটি হল খুচরো প্রবন্ধের প্রকাশক পাওয়া যায় না। লেখকরা পরিশ্রম করে হয়ত প্রবন্ধ লিখলেন, পত্র-পত্রিকার মেয়াদ ফুরোলেই সেগুলি অন্তেবাসী হয়ে গেল। কে আর পরিশ্রম করে প্রবন্ধগুলি খুঁজবে? এরকম বহু ভাল প্রবন্ধের পত্র-পাত্রিকারই মৃত্যু ঘটেছে। অনেক লেখক ভালো প্রবন্ধলিখতেন ---তাঁদের নাম অখ্যাত রয়ে গেছে কিন্তু কোন সময়ে পুরনো পত্র-পত্রিকা ঘাঁটলে ঐ সব রত্ন থেকে ঔজ্জ্বল্য এখনও ঠিকরে পড়ে। প্রাবন্ধিকদের প্রকাশকের অভাবে উদ্যমও ফুরিয়ে যায়। সেজন্য পাঠশ্রমী প্রবন্ধের অভাব থেকে গেছে। এখন কোনরকমে একটা দাঁড় করিতে দিতে পারলেই হল। রবীন্দ্রনাথের কথায় স্ফুলিঙ্গ পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ, উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল সেই তার আনন্দ।

(৩) ৬০, ৭০ ও ৮০-র দশকে সৃজনশীল লেখক হিশেবে অনেক কবি, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিকের নাম করা যায়। কিন্তু প্রাবন্ধিকের নাম করা যায় না। কেন নাম করা যায় না তার কারণও আগে বলেছি । আমার দৃষ্টির বাইরে হয়তো কেউ থেকে যেতে পারেন। কিন্তু সামগ্রিক ব্যাপারটা হতাশার । তা বলে কি ৬০, ৭০, ৮০-র দশকে কেউ প্রবন্ধ লেখেন নি, লিখেছেন, কিন্তু তা হয় একাডেমিক নয় সংবাদসুলভ। ঠিক যেভাবে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাদ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুশোভন সরকার, শঙ্খ ঘোষ অলোকরঞ্জনদের পেয়েছিলাম,

তেমনটি এখন আর পাই নি। কারন (ক) প্রবন্ধ লেখার জন্য যে পাঠন-অভ্যাস প্রয়োজন তা ৬০-এর শেষ থেকে কমতে শু করেছে -- এখন প্রয় শূন্যতে ঠেকেছে বলে মনেও হতে পারে। (খ) নানা বিষয়ে কৌতুহলী হয়ে পাঠন দরকার তাও কমে গেছে। (গ) ডিগ্রী স্তরে সাহিত্যকে অবশ্যপাঠ্য না করার সরকারী সিদ্ধান্তও এর জন্য দায়ী হতে পারে (ঘ) প্রতিষ্ঠানিক লেখাপড়াটা ভীষণভাবে বাণিজ্যিক হয়ে গেছে (ঙ) প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা মূল বই পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করেছে। শিক্ষার্থীরা আজ সবই পরীক্ষার্থী সেজন্য চিন্তা করার প্রবনতা হারিয়ে ফেলেছে । তাই তাদের কেউ কেউ কল্পনা শক্তি ও বাস্তব ঘটনার অভিঘাতে অনুভবে কবিতা গল্প লিখছে কিন্তু প্রবন্ধ লিখতে পারছেনা।

(৪) প্রবন্ধ হচ্ছে Workofprose সহজ ও স্বাভাবিক গদ্যে লেখার রীতিই হচ্ছে প্রবন্ধের সর্বপ্রধান শর্ত । Literature of knowledge তন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানের প্রবন্ধ সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস সমাজ অর্থনীতি রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়মূলক প্রবন্ধএবং Litereture of power মন্ময় অর্থাৎ সৃষ্টিশীল। প্রবন্ধের উভয় শাখারই প্রধান শর্ত হচ্ছে জটিলতাবর্জিত প্রকাশভঙ্গী। ভঙ্গীর মধ্যে লেখাকের ব্যক্তিত্ব এমনভাবে সঞ্চারিত হবে যা পাঠককে পীড়িত করবেনা অথচ বিস্ময় রহস্যকে উজ্জ্বল করে তুলবে। প্রবন্ধের মধ্যে তত্ত্ব, তথ্য, অনুভূতি, যুক্তি নিষ্ঠা যেমন থাকবে তেমনি বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে সাহিত্যরসও থাকবে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের অ াদর্শ প্রবন্ধ। এ জাতীয় আর কেউ লিখতে পারেন নি।

(৫) প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গীকে প্রথমে জটিল করে তোলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যেমন উপন্যাসে কমলকুমার মজুমদার। বাংলাকে সংস্কৃতানুসারী করতে গিয়ে প্রধানত ইংরেজি অবক্ষয়ী সমাজের শিকার হয়ে পড়েন। পাশ্চাত্যের পান্ডিত্যাভিমান তাঁর ছিল। বিষ্ণু দেও তাঁর পথের পথিক হয়েছেন, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তও কিছুকাল এই নেশায় বুঁদ হয়েছিলেন পরে তিনি নিজের বোধির দ্বারা বুঝতে পেরে সোজাপথের পথিক হয়েছেন। প্রবন্ধ রচনায় যাঁরা খ্যাতিমানহয়েছেন এবং প্রাবন্ধিক হিস াবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরা ঐ রীতিতে প্রবন্ধ লেখেন নি। আমাদের সাহিত্যে Intelluctual giant বলতে ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে বোঝায়। অথচ তাঁর প্রবন্ধ কত সহজ সরল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বিদ্যা বা পান্ডিত্যের অহমিকা প্রকাশ পায়নি। Wisdom in a smiling mood -এর এমন এক ভাবমন্ডলি সৃষ্টি করেছে যে পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। অ্যারিস্টটলের সূত্র উল্লেখ করে W.B. Yeats এর বান্ধবী লেডি গ্রেগরি বলেছেন, চিন্তা হবে মহাপন্ডিতের মতো, ভাষা হবে সরল কৃষকের মতো। প্রবন্ধ হবে এই রকম। হুমায়ুন কবির, কাজী আবদুল ওদুদ, অমলেন্দু বসু, অন্নদাশংকর রায়, সরোজ আচার্য, অম্লান দত্ত, অশোক মিত্র (১-২), শিবনারায়ণ রায়, নারায়ণ চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী, ভবতোষ দত্ত, চিত্তরঞ্জন রন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রগুপ্ত, এস ওয়াজেদআলী, সৈয়দ আলী অহসান, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, কাজী আব্দুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক। আরো অনেকেই আছেন তঁ াদের নাম উল্লেখ করা হল না তাই বলে কেউ যেন মনে না করেন তাঁরা উল্লেখযোগ্য নন।

(৬) বিষয় সম্পর্কে কোন লেককের যদি স্বচ্ছ ধারণা না থাকে তাহলে তার প্রখাশভঙ্গী আড়ষ্ট হয়ে পড়ে এবং তখন সে বিষয়কে ভাষা মারফৎ জটিল করে তোলে। প্রাবন্ধিকের সবচেয়ে বড়ো কাজ হচ্ছে নিজের অনুভুতিকে অনাড়ম্বরে পাঠকের হৃদয়দুয়ারে পৌঁছে দেওয়াই প্রধান ও একমাত্র কাজ। তাদের সমতলে তাদের মত করে বক্তব্য বলে যাওয়া এবং নিজের আলোতে তাদের চেনা শুধু নয় তাদের আলোতেও প্রাবন্ধিক যেন নিজেকেআবিষ্কার করেতে পারেন। এদিকে দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ আমার কাছে আদর্শস্থল।

(৭) বিষয়ের জটিলতাকে প্রকাশের দ্বারা সরল করতে হয় যেমন করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুশীলকুমার দে, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারসেন,শশিভূষণ দাশগুপ্ত গোপাল হালদার, মহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ অবদুল হাই, মুহম্মদ এনামুল

হক প্রমুখেরপ্রবন্ধ পাঠকেরা সানন্দে পড়ে থাকেন। আর যাঁরা সরল বিষয়কে প্রকাশের দ্বারা অলঙ্করণে জটিল করেন কিংবা জটিলবিষয়কে আরও জটিলতার করেন তাঁদের প্রবন্ধ পাঠকেরা পড়েন না এবং তাঁদের রীতি বাংলা প্রবন্ধের গতিপ্রকৃতিথেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে । উনিশ শতকে প্রবন্ধের যে রীতি বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন সেই রীতিই আদর্শ রীতি এবং এই রীতির পরিপুষ্ট সাধনে নানা ধরনের সাধু চলিত ভাষায় আন্দোলন হয়েছে কিন্তু সব আন্দোলনের মূলকথা ছিল সরল গতিভঙ্গী। প্রবন্ধ হবে simple lucid restraint and remorseless insight সেজন্য গতি হবে তীব্র তখন স্বাভাবিকভাবে ভারও তার হাল্কা হবে।

(৮) বিষয় নির্বাচনে সাহিত্যবিষয়ক বস্তুর ওপর অত্যধিক প্রাধান্য দেওয়ার ফলে সাহিত্যছাড়া অন্য বিষয়ের যেমন অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, মানুষের বেশভূষা, আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া আরো অনেক কিছু বিষয়ের আলোচনার দিকটা দুর্বল রয়ে গেছে। ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মত সামাজিক প্রবন্ধ পারিবারিক প্রবন্ধ এর মত আজকাল আর প্রবন্ধ লেখা হয় না একমাত্র রাজশেখর বসুর চলচ্চিন্তা প্রায় এধরণের বই। জ্ঞানবাদী সাহিত্যকে সাধারণত সাহিত্যের মর্যাদা দিতে অনেকেরই কুণ্ঠা থাকে । জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের ওপর লেখা প্রবন্ধ তাঁদের কাছে যথোচিত সম্মান পায় না। ফলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিষয়মুখী বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার ধারাবাহিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি । আর পাঠকদের ঝোঁকও কমবেশী সাহিত্যাশ্রয়ী বিষয়ের ওপর থাকার জন্য বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন জ্ঞানের বিস্তৃতি আশানুরূপ ঘটে নি। পাঠকরা বটতলার ট্রাস গল্প উপন্যাস পড়ার জন্য হামলে পড়ে কিন্তু জ্ঞানমূলক কোন বই হলে তাদের হাই উঠতে থাকে, বাইকে সরিয়ে রাখা। এজন্য উনিশ শতকে বাংলা প্রবন্ধের যে মান ছিল বর্তমামে তা অনেকটা কমে গেছে। চটুলধর্মী রচনার প্রাদুর্ভাবে ভারী বিষয়ের প্রবন্ধের আকাল হয়েছে। পাঠক ও প্রকাশকের অনীহার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ঐতিহ্য ধবসে পড়ার উপক্রম হয়েছে। কয়েকটি বিষয়ের উদাহরণ দিতে চাই। প্রথম উদাহরণ ইতিহাস চর্চার ঐতিহ্য রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রের, রজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিলনাথ রায় যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন তার অনুসরণে যদুনাথ সরকার রমেশচন্দ্র সেন, নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য, নীহররঞ্জন রায়, সুশোভন সরকার, তপনমোহন চট্টপাধ্যায়, অমলেশ ত্রিপাঠি,প্রমুখ সমৃদ্ধ করেছিলেন কিন্তু বর্তমানে ইতিহাস যা লেখা হচ্ছে বিশুদ্ধ ইতিহস চর্চার তাগিদে ততটা নয় যতটা বৈষয়িক প্রয়োজনে। অমলেন্দু দে, গৌতম নিয়োগী, সুকুমারী ভট্টাচার্য সাধ্যমত তাঁদের কর্তব্য পালন করে চলেছেন। এরকম বৈজ্ঞানি প্রবন্ধের ঐতিহ্যের কখনও উল্লেখ করা যেতে পারে। যে ঐতিহ্যের গোড়াপত্তন উনিশশতকে শু হয়েছিল তাকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, চাচন্দ্রভট্টাচার্য, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, সমরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ সমৃদ্ধ করেছিলেন সেটি আজ বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ ও কল্পবিজ্ঞানে এসে ঠেকেছে।রাজ্যপুস্তক পর্ষদ যেসব বিজ্ঞান বিষয়ক বই বের করেছেন তা প্রধানত ছাত্রদের জন্য। মুনাফাবৃত্তিরই রমরমা আজ। আমি জানি জ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু কিছু বিষয়ভিত্তিক গভীর আলোচনা হচ্ছে যেমন সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র, মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ, সঙ্কর্ষণ রায়, দেবেন্দ্র মোহন বিশ্বাস প্রমুখ সেটা ব্যতিত্রম বলেই ধরতে হবে কারণ ইদানীং পাঠকদের মধ্যে জ্ঞানতৃষ্ণার বড্ড অভাব। সঙ্গীত কিংবা রাজনীতি অর্থনীতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের আলোচনাও কমে এসেছে এসেছে। দিলীপকুমার রায়, ধূজটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ,নারায়ণ চৌধুরী, রাজ্যের মিত্র, অমিয়নাথ সান্যাল, অণ ভট্টাচার্য গত হবার পর সঙ্গীতের রসসমৃদ্ধ মননশীল আলোচনা খুব বেশি হচ্ছে না । সুরের রাজ্যে আজ অসুরদের উৎপাতই সবচেয়ে বেশি । রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনায় মুজফফর আহমদের সহজ সরল ভাষায় প্রকাশের ধারাও ক্ষীয়মান। সরোজ আচার্য, রেবতী মোহন বর্মণ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (লোকায়ত দর্শনের) ছিলেন। তাঁরা বিগত হবার পর সেরকম উল্লেখযোগ্য রাজনীতি বিষয়ের ব্যাখ্যাকার আর কাউকে দেখছিনা।

(৯) প্রত্যেকরই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী বা মতবাদ থাকে। যুক্তি ও বুদ্ধি প্রবন্ধের অন্যতম শর্ত হলেও মনের সহজ প্রসন্নতাকে ক্ষুন্ন করে মতবাদ যেন প্রধান হয়ে না ওঠে। কিছু লেখকদের মধ্যে মতাদর্শকে উৎকটভাবে তুলে ধরার প্রবণতা আছে দেখছি। এদিক দিয়ে গোপাল হালদারের প্রবন্ধ আমার কাছে আদর্শ ---তিনি বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী হয়েও তাঁর রচনার মধ্যে সেই মতবাদ মাথা তুলে দাঁড়ায়নি---পাঠক নিজের অজান্তেই কখন যে তাঁর সঙ্গী হয়ে পড়েন তা নিজেই বুঝতে পারে ন

া। দৃষ্টিশক্তি চিন্তাশক্তি, বাচনিক গতিশীলতা আর আন্তরিকতা গোপাল হালদারের প্রবন্ধের মধ্যে আছে বলেই তিনি কোন্ মতবাদে বিশ্বাসী এ প্রশ্ন মনের মধ্যে জাগে না। তিনি এক জায়গায় মতবাদী লেখকদের সম্পর্কে বলেছেন, ..শিল্প মানে কোনো নীতি বা আইডিয়া বা শ্লোগান আওড়ানো নয়। শিল্পীর কাজ হলবাস্তব (concrete) নিয়ে--- মানুষ নানাসূত্রে বাঁধা, তার মনুষ্যত্ব জটিল বিচিত্র, ভালোবাসায় দেশভক্তিতে লোভে ভয়ে সব জড়িয়ে সে একটা বিশেষ মানব (Individual)। তাই আমাদের শিল্পীরা এই পার্টি শ্লোগান বলবার ঝোঁকেশিল্পের উদ্দেশ্য ভুলে যান, মানে রূপসৃষ্টি করতেই ভুলে যান। তাঁদের গান, ছবি, নাটক, কবিতা তাই অনেক সময় হয় নিষ্প্রাণ, হাস্যকর। অথচ কমিউনিজমে জ্ঞান থাকলে এ ভুল ঘটতেই পারেনা ।(কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব ঃ সংস্কৃতির বিরূপ) আবার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন তত্ত্বাশ্রয়ী নিছক বুদ্ধিবাদের চর্চা প্রবন্ধিকদের কাছে চাই না।তাঁরা সমাজভুক্ত মানুষ কাজেই দেশ ও সমাজের বিপদ ও সংকটের মুহূর্তে তাঁদেরকেও মোকাবিলা করতে হবে ---এই কথা মনে রেখেই তাঁরা সৃষ্টির কাজে নিজেদের নিয়োজিত করবেন। দেশের নানা সংকট মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ যেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই আদর্শকে সামনে রেখেই চলতে হবে।

(১০) আর একটি বিষয় আমাকে পীড়া দেয় ---পত্রিকার মুখ চেয়ে লেখা ।পত্রিকা কী ধরণের লেখা চায় এবং কোন মতাবলম্বী তার মত করে প্রবন্ধ লেখা হয়। আবার ঐ লেখকই অন্য পত্রিকা কোন মতের কাগজ তার মত করে লেখেন। একই লেখকের লেখা বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতের পত্রিকায় দেখা যায় । আসলে লেখক কোন্ পক্ষে অবস্থান করেছেন তা নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এই জাতীয় লেখকরা তলারও খান গাছেরও খান, দুধও খান তামাকও খান--- দু পক্ষ থেকেই সুযোগ -সুবিধে পুরোপুরি নিয়ে থাকেন। এমন কয়েকজন প্রবন্ধ লেখক আছেন শুধু প্রবন্ধ লেখকই বলি কেন অন্য বিষয়ের লেখকরাও প্রতিষ্ঠানিক পত্রিকাতেও লিখে থাকেন আবার বামপন্থী কাগজেও লিখে থাকেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই বামপন্থী পত্রিকাও সেইসব লেখকদের প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন যেখানে তাঁরাএকটি মতাদর্শে বিশ্বাসী অথচ এই বিশ্বাসী লেখকদের রচনা ঐসব প্রতিষ্ঠানিক পত্রিকা ছাপেনা । তাই প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কেন দ্বিচারী লেখকদের বামপন্থীরা প্রশ্রয় দেবেন? সুবিধেবাদী প্রবন্ধ লেখকদের সংখ্যা ইদানীং বেশ কিছু পরিমাণে বেড়েছে। এরা কোন্ শিবিরের লেখক, সাধারণ পাঠক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যান। নাম আমি করব না --- আমি যে কথা বলতে চাইছি বুদ্ধিমান পাঠক তা ধরে ফেলবেন আশা করি। লেখকের চরিত্র থাকবে না তিনি বহুচারীহবেন এটা আমাকে ব্যথা দেয় বিশেষ করে প্রবন্ধকার যাঁরা প্রকৃত যুক্তিবাদী তথ্য নিষ্ঠা বিজ্ঞানভিত্তিক কথা স্পষ্টভাবে বলে থাকেন --- তাঁদের এরূপ ভূমিকা সহ্যের অতীত এবং যাঁরা এঁদের প্রশ্রয় দেন তাঁরা ক্ষমার অযোগ্য। আজদিন এসেছে সোজাসুজি বলতে হবে আমি কাদের দলে । সাহিত্যে নিরপেক্ষতা বা সমতা রক্ষা করার নীতি স্রেফ একটা ধাপ্পা।

(১১) চীনদেশে প্রবাদ আছে মুরগী যখন মোরগের মত ডাক দেয় তখন বুঝবে দেশের পতন আসন্ন। এই কথনেরসঙ্গে আরও একটি কথা যোগ করা যেতে পারে সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যদি সংবাদপত্র লাঠি ঘোরায় তাহলে বুঝবে সেই জাতির বিনাশ হতে আর বেশি দেরি নেই। বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে আজ এক সংবাদপত্র গোষ্ঠী মাতববরী করছে তারাই যেন সবকিছুর দন্ডমুন্ডের কর্তা। তারা এমন এক পর্যায়ে উঠেছে যে তাদের রায়ই শেষ রায়, তারা যাদের লেখক বা সাহিত্যিক বলবে তারাই লেখক বাদবাকীরা গ ছাগল। সাংবাদিক কলমচীরা ,মূল্যবোধগুলি বিনষ্ট করছে, রচনারীতির ক্লাসিক ভঙ্গীর মধ্যে সিরিয়াস বিষয়ের মধ্যে ভেজাল দিতে শু করেছে, হালকা চটুলতা আমদানী করে গভীর বিষয় নিয়ে যাঁরা ভাবনাচিন্তা করেন তাঁদের প্রকাশের দরজা বন্ধ করছে। বাংলা ব্যাকরণ ও বানান নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, সব কিছু অর্থ দিয়ে কেনা যায় এমন দাপট বা দম্ভ তাদের হয়েছে। বেশ কিছু লেখক শিল্পী তারা কিনে রেখেছে। গল্প উপন্যাসের ভাষাভঙ্গীর মধ্যে কাহিনী বয়নের মধ্যে চিহ্নীনতার যেমন ছাপরয়েছে তেমনি প্রবন্ধের নামে রম্যরচনার আবরণ জড়িয়ে বিষয়ের গুত্বকে হালকা করে দিচ্ছে । Women lib এর নামে চতুর্থ শ্রেণীর লেখিকাকে প্রথম শ্রেণীর লেখিকার মর্যাদা দিয়ে সার্টিফিকেট দিচ্ছে আর তাই তাকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচানাচি শু হয়েছে। এই রকম পরিস্থিতিতে প্রবন্ধসমালোচনা এখন হয়ে উঠেছে সাংবাদিক অধ্যাপকদের পেশা--প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা কলম গুটিয়ে নিয়েছেন। ভেকেরা যেখানে বক্তা সেখানে নীরব থাকাই ঠিক।

(১২) প্রবন্ধের এরকম দৈন্যদশাগ্রস্থ, প্রকাশে অনীহা কিংবা সাহিত্য-সংস্কৃতির ওপর কোন সংবাদপত্রগোষ্ঠীর আধিপত্য বিস্তার পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশে আমি দেখিনি । দেশ বিভাগের অনেক আগেই প্রধান প্রধান হিন্দু লেখকরা কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়েন---যেটুকু ছিঁটেফোটা ছিল দেশভাগের সময় ঝেঁ টিয়ে চলে এলেন। এপারেকর্মসূত্রে যেসব মুসলিম বুদ্ধিজীবী ছিলেন যেমন গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৮৬৪) ড. মুহম্মদ কুদরত এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৮), সৈয়দ অ ালী আহসান (১৯২২-২০০০), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), ড. মুহম্মদ এনামুলহক (১৯০৬-১৯৮২), আবু মহাম্মদ হবিবুল্লাহ (১৯৯১-১৯৮৪) প্রমুখ যাঁদের মধ্যে অনেকেরই জন্মভূমি ছিল পূর্ব বাঙলায়, তাঁরা ফিরে গেলেন। আর নিজের জন্মভুমি ছেড়ে এপারে রয়ে গেলেন হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯), কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৯৮-১৯৭০), সৈয়দ মুজতাব আলী (১৯০৪-১৯৭৪) যদিও মুজতবা আলী মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে ওপারে ফিরে গিয়েছিলেন --- তাঁর যাবতীয় সাহিত্য কর্ম এপারেই সমাধা হয়েছিল। এপার বাংলায় উল্লেখ্যযোগ্য মুসলিম বুদ্ধিজীবী বলতে ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯) আর অবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩)। এই রকম পরিস্থিতিতে তাঁরা ভেঙ্গে পড়লেন না---বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে সম্বল করে সাহসিকতার হঙ্গে নিজেদের সাহিত্য সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করার মানসে তৎকালীন তণ প্রজন্ম কাজ শু করে ছিলেন যাঁরা আজ প্রৌঢ়ত্বের কোঠায় উপনীত । অচিরকালের মধ্যে প্রবন্ধ ও গবেষণার ক্ষেত্রে এমন এক বিরাট কাজ সম্পন্ন করলেন যা স্বাধীনতার পর এপার বাঙলায় আমরা ঐ ধরনের কাজ ঐ সময়ের মধ্যে করে উঠতে পারিনি। আমরা একধরণের আত্মতৃপ্তির রোগে তখন ভুগ ছিলাম । আমাদের থেকে তাঁদের সামনে প্রতিবন্ধকতা প্রতিকূলতা সেদিনকম ছিল না। সবকিছু নতুন করে গড়তে হয়েছে। প্রথমত, কোন শ্রেনীর গবেষক ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, গবেষণামূলক কাজ করার জন্য হাতের কাছে ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কিংবা এশিয়াটিক সোসাইটির মত কোন সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল না। ঢাকা ঝিবিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাড়া নতুন যেসব ঝিবিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল যেমন রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীর নগর সেখানে কোন ভাল উন্নত গ্রন্থগার তখনও গড়ে ওঠেনি। ঝিবিদ্যালয়ের বাইরের কোন পন্ডিত বা গবেষকের পক্ষে ঝিবিদ্যালয় গ্রন্থাগারে বসে ক াজ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বৃটিশ কাউন্সিল এবং ইউসিস এর গ্রন্থাগার ছাড়া আর কোন পড়াশুনা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। রাজশাহীর শতর্বর্ষের স াধারণ গ্রন্থাগার কিংবা রাজশাহী শহরে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম অথবা কুমিল্লার রামমালা রিসার্চ লাইব্রেরী ছিল কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় গোস্পদ মাত্র। পরে এই সংকট বাংলাদেশীরা কাটিয়ে উঠেন। বাংলা একাডেমীর গ্রন্থগাল এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পুরোণো গ্রন্থাগার ত্রমশঃ সমৃদ্ধ হতে থাকল এবং নতুন প াঠনের কেন্দ্র খুলতেলাগল। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র স্থাপিত হল। ১৯৫১ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান যার অধুনা নাম এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ । প্রতিষ্ঠান দুটিরই নিজস্ব মুখপত্র ও প্রকাশন বিভাগ আছে এবং সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগারও আছে। বাংলাদেশ যাদুঘর তৈরি হল । ১৯৫৪, ৩রা ডিসেম্বর বাংলা একাডেমী,১৯৬৩ কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড স্থাপিত হয়। পরে অথ্যাৎ ১৯৭২, ১৭ই মে বোর্ড একাডেমীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কলকাতা ঝিবিদ্যালয়ে মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের গবেষণাপত্র অমুদ্রিত অবস্থায় পড়েছিল, মুসলিম হওয়ার দণ ও মুসলিম ঐতিহ্যর বিষয় হওয়ার ফলে প্রকাশে দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করা হয়েছিল। সেগুলি প্রকাশের দায়িত্ব এশিয়াটিক সোসাইটিও কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গ্রহণ করে। ড. মুহম্মদ এনামূল হকের A history of Sufism in Bengal ড.শেখ গোলাম মকসূদ হিলালীর Perso–Arabic Elements in Bengali বইগুলি প্রকাশিত হয়।

বাংলা একাডেমীর প্রধান লক্ষ্য ছিল (১) প্রাচীন পান্ডুলিপি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (২) প্রাচীন পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ (৩)লোক সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (৪)রচনাবলী প্রকাশ (৫) সৃষ্টিধর্মী রচনা প্রকাশ (৬) মৌলিক গবেষনা গ্রন্থ প্রকাশ (৭) জীবনী গ্রন্থ প্রকাশ (৮) অনুবাদ কর্ম (৯) গবেষণা বৃত্তি দান (১০) সাহিত্য পুরস্কার দান (১১) সাংস্কৃতিক কর্মসূচী, আর বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষাকে শিক্ষা ও সরকারী কাজের বাহন হিশেবে গড়ে তোলা। এই কাজ সুচা ভ াবে বাংলাদেশে রূপায়িত হচ্ছে যা এপার বাঙলায় অকল্পনীয়।

বাংলা একাডেমী তাঁদের লক্ষ্য পূরণের জন্য ১৯৫৪ -১৯৯৯ জুন পর্যন্ত মোট ২৯৭২ টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ---- প্রায় সবকটি গ্রন্থে মান ও মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। এসব গন্থে সবই প্রবন্ধ -- জীবনী, পরিভাষা অভিধান, বিজ্ঞান ও গবেষণামূলক গ্রন্থ। লোক সাহিত্য সংরক্ষণে ও গ্রন্থ প্রকাশে এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম রীতিমত বিস্ময়ের উদ্রেক করে তাদের নিজস্ব ৬টি সাহিত্য পত্রিকা আছে যথা উত্তরাধিকার সৃজনশীল সাহিত্য ত্রৈমাসিক, বাংলা একাডেমী পত্রিকা গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক, বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা ষান্মসিক, ইংরেজি ভাষায় [illegible], তাদের নিজস্ব ষান্মাসিক, ধানশালিকের দেশ, কিশোর সাহিত্য মাসিক, লেখা মাসিকপত্র। এরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিয়মিত ভাবে ঢাকা বাজশাহী, চট্টগ্রাম জাহাঙ্গীরনগর িবিদ্যালয় সমূহের বাংলা বিভাগের ৪টি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। নাম যথাক্রমে সাহিত্য পত্রিকা, সাহিত্যিকি, পাড়ুলিপি, ভাষা ও সাহিত্য পত্র। ইসলামিক ফউন্ডেশনও সহস্রাধিক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে ধর্মীয় ও সাহিত্য গবেষণামূলক গ্রন্থ ও রয়েছে ।ফাউন্ডেশেনের ৮টি মুখপত্র রয়েছে। মানবদ্যিা নানা প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য বাংলা দেশ ভাষা সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৭৬, ৭ই জুলাই কতিপয় বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাষাপত্র নামে তাঁদের এক বার্ষিক মুখপাত্র আছে এবং তাঁরা বাংলা ভাষা সংক্রান্ত বিষয় গবেষণা গ্রন্থওপ্রকাশ করেন। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করতে হয়। সেটি হল এধারের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সাহিত্যসাধক চরিতমালা ১৩৪৬সালে প্রবর্তন করেন।১৪০৮ পর্যন্ত তাঁরা ১৮টি খন্ডে১৪৫ জনের জীবনী প্রকাশ করেছেন। এই ১৪৫ জনের মধ্যে মুসলিম সাহিত্যিকের জীবনী রয়েছে ৫জনের --- তাঁরা হলেন মীর মশাররফ হোসেন, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী নজল ইসলাম, রেজাউল করীম ও মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা। ঢাকার বাংলা একাডেমী অমর একুশের স্মরণে ১৯৮৭ থেকে জীবনী গ্রন্থমালা প্রকাশের প্রকল্প গ্রহণ করেন। তাঁরা এ পর্যন্ত (১৯৯৮,মে) মোট জীবনী প্রকাশ করেছেন ১২৪ জনের তার মধ্যে হিন্দু সাহিত্যিকের জীবনী রয়েছে ৩৫ জনের ।এই দুটি প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রভেদ রয়েছে।

আমার এই সব ফিরিস্তি দেবার উদ্দেশ্য হচেছ যে প্রবন্ধ প্রকাশের ক্ষেত্র এপার থেকে ওপারে কত ব্যাপক এবং বিস্তৃত তা দেখানো। জ্ঞানের সাহিত্য সৃষ্টি এবং বিস্তারে সেখানকার সাধারণ পাঠকরা সহায়তা করেন বলেই ঐসব মাধ্যম বেঁচে আছে এবং প্রকাশকরাও প্রবন্ধের বই প্রকাশে উৎসাহিত হন। উদাহরণস্বরূপ মুক্তধারা প্রকাশনীর কথা বলতে পারি। বাংলাদেশে গল্প উপন্যাস থেকে মননশীল রচনা গবেষণামূলক গ্রন্থপ্রকাশের সংখ্যা কোন অংশে কম নয় এবং পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধাদি বেশ মান্যসহকারে ছাপাও হয়। আমাদের দেশে প্রবন্ধের বই নিয়ে প্রকাশকের দুয়ারে দুয়ারে লেখককে ঘুরতে হয় তাদের কণাভিক্ষা করতে হয়। বাংলাদেশে অন্ততঃ এরকম কণ অবস্থা নয় কারণ তাঁরা বুঝেছেন দেশের মানসিক ঐর্য এবং উৎকর্ষ বাড়াতে হলে জ্ঞানের সাহিত্য দরকার। আর একুশে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের এই সৃষ্টির উৎসমূলে এত জীবন্ত জোয়ার যুক্ত করে দিয়েছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুহম্মদ এনমূল হক, মূহম্মদ মনসুউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭), শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী, মোহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৫) আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) মোতাহের হোসেন চৌধুরী প্রমুখর সঙ্গে নতুন প্রজন্মের মুহম্মদ আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), মোফাজুল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১), আনোয়ার পাশা (১৯২৮-১৯৭১) সৈয়দ আলী আহসান, আবদুল হক চৌধুরী (১৯২১-১৯৯৪), অহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯), কাজী আবদস মান্নান (১৯২৫-১৯৮৪), গোলাম সাকলায়েন (১৯২৬) আশরফ সিদ্দিকী (১৯২৭-), বদদ্দীন ওমর (১৯৩১-), মুস্তফা নূর-উসলাম (১৯২৭-), আবদুস সাত্তার (১৯২৭), রফিকুল ইসলাম (১৯৩৪), মাহমুদশাহ কোরেশী (১৯৩৬), আনিসুজ্জামান (১৯৩৭), আবুল কালাম মনজুর খোরশেদ (১৯৩৮) মোহাম্মদ মনিজ্জামান (১৯৩৬), মোহম্মদ মাহাফুজউল্লাহ (১৯৩৬) শাসসুল হক (১৯২৮) শামসুজ্জামান খান (১৯৩৭) সিরাজূল ইসলাম চৌধুরী (১৯৩৬), সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (১৯২৯-১৯৮৪), হায়াৎ মামুদ (১৯৩৯) রাজিয়া সুলতান (১৯৩৭), মোবাৱের আলী (১৯৩১), মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (১৯৩৩), মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল (১৯৩২), আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৩৬-১৯৯০), কবীর চৌধুরী (১৯৩২), মুহম্মদ মজীরউদ্দীন মিয়া (১৯৩৯-১৯৯৯), মনিজ্জামান (১৯৪০), মযহাল ইসলাম (১৯২৮), খোন্দকার সিরাজ্জুল হক (১৯৪১) খোন্দকার রিয়াজুলহক (১৯৪০) প্রমুখ লেখক বাংলাদেশের প্রবন্ধ গবেষণার শাখাকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং সামগ্রিক ভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরই লাভ হয়েছে তাতে।

উপসংহার ঃ-- দেশ সমাজ সাহিত্য সংস্কৃতির সংকটের মোকাবিলা করে সাহিত্য সংস্কৃতির পূর্ব গৌরব কীভাবে আসবে তার দু-তিনটি পথের দিশা আমি চিন্তা করেছি। পথের হদিশের কথা বলেই এ প্রসঙ্গের ইতি টানব।

সর্বপ্রথম কাজ পাঠক তৈরি করতে হবে। বোঝাতে হবে যা চকচক করে তাই সোনা নয়---রমনী মাত্রই সাহিত্য নয়। জ্ঞানবাদী সাহিত্যের চর্চা না করলে আবেগ ও কল্পনার জগৎ সমৃদ্ধ হবে না দুদিনেই পট্টলিকা ফুলের মত ঝরে পড়বে। এই গুত্বপূর্ণ কাজ প্রাথমিক এবং প্রধানভাবে করার দাযিত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত গ্রন্থ াগার সমূহের।১৯৮৬-৮৭ বছরের হিশেব অনুযায়ী পশ্চিবঙ্গে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৪২৩। কিন্তু এই সব গ্রন্থাগার প্রবন্ধের বই জ্ঞানবাদী সা হিত্যের বই কেনে না বললেই চলে -- যদি কিনত তাহলে প্রকাশকরা প্রবন্ধের বই বের করার দিকে উৎসাহিত হতেন কারণ তাঁরা অর্থলগ্ন ব্যবসার স্বার্থে করেন সা হিত্যকরার মানসে নয়। প্রতিবছর সরকারী অনুদান এই সব গ্রন্থাগার পেয়ে থাকে। অধিক কমিশনের লোভে উপন্যাস কেনে। সরকার প্রতিবছর বই মেলার আয়ে াজন করেন, গ্রন্থতালিকাও প্রকাশ করেন কিন্তু হিশেব নিলে দেখা যাবে প্রবন্ধের বই কটা বিক্রি হয় ? সরকার উপন্যাস বাদে অন্যবিষয়ের বই কেনার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! কে দেখে কার কাজ। সরকার নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে প্রবন্ধের নামে ভাঁড়ামি রম্যরচনা ভ্রমনোপন্যাস গল্পোগেলা প াঠকদের জন্য কেনা হয়, কিছু ছাত্রপাঠ্য প্রবন্ধের বইও কিনে থাকে । তাই সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখা যেতে পারে গ্রন্থত্রয়ের মোট অনুদানের শতকরা পঁচিশভ াগ অর্থ আবশ্যিকভাবে জ্ঞানবাদী সাহিত্য কেনার জন্য বরাদ্দ রাখা হোক। দু-তিন বছর গল্প উপন্যাস কেনা বন্ধ থাক। যে কোন গ্রন্থাগারে গেলে দেখা যাবে গল্প উপন্যাসে ঠাসা একাধিক আলমারী আর প্রবন্ধের বই আলমারীর একটা তাকের কোনের দিকে পড়ে আছে। অধিকাংশ গ্রন্থাগার কর্মী বই পড়ে না, বইয়ের খেঁ াজখবর রাখেন না, তাঁরা চাকরীর জন্য করে থাকেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ট্রেনিং নিয়ে ভাল গ্রন্থাগারিক হওয়া যায় না যেমন বি.এড. পড়ে ট্রেনিং নিয়ে ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না ----- যদি তাঁরা বই ভাল না বাসেন, বই না পড়েন সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা গুদাম - রক্ষকের যোগ্যতা নয় আতিথ্য পালনের যোগ্যতা চাই। যদি তাঁরা নিজেকে জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ করতেন তাহলে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির এমন শোচনীয় অবস্থা হতনা । তাঁরা সমৃদ্ধ হলে তাঁদের সংস্পর্শে যেসব পাঠক প্রত্যহ আসা যাওয়া করেন তাঁরাও সাহিত্য সম্পর্কে কিঞ্চৎ সচেতন হতেন, কোনটা ভাল কোনটা মন্দ এটুকু বুঝে বই পড়ায় আগ্রহ প্রকাশ করতে পারতেন। ফলে যে আশা নিয়ে সরকার গ্রন্থাগরগুলি গড়ে তুলেছিলেন গ্রন্থাগারগুলি পাঠক তৈরির বদলে অপাঠক তৈরি করছে যারা sex violence পড়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়ত, ডিগ্রী স্তরে কী প্রজ্ঞাস (Arts) কী বিজ্ঞান কী বানিজ্য বিভাগে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরেও যে যে বিষয় নিয়ে পড়ুক না কেন বাংলা সাহিত্য পড়া, যেন অ াবশ্যিক থাকে। কার্লাইল বলেছিলেন, সাহিত্যপাঠ ছাড়া কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। সেজন্য বিজ্ঞানের পীঠস্থান জার্মনীতে সর্বোচ্চ ডিগ্রী পেতে হলে সাহিত্যে একশো নম্বর পেতে হয়। গ্যেটে মিলার পড়তে হয়। কিন্তু আমাদের এক পশে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত কিছু বাংলা সাহিত্য পড়ানো হয় তারপর সাহিত্যের বিষয় শূণ্য। আমাদের দেশে সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীরা রবীন্দ্রনাথের কোন বইই পড়েন নি । মাতৃভাষার মাধ্যমে যখন নীচু থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থার কথা আমরা বলি তখন বাংলা সাহিত্যকে প্রত্যেকের জন্য আবশ্যিক কেন করব না। যাঁরা পাঠদান করবেন আর যাঁরা পাঠগ্রহণ করছেন তাঁরা ভাষাটা ভালভাবে শিখতে পারবেন এবং বাংলাভাষায় নিজ নিজ বিষয়ে বই লেখার স্পৃহাও তাঁদের মধ্যে জাগতে পারে। সত্যেন বোস যিনি সারাজীবন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই রচনা করার জন্য আকুল আহবান জানিয়ে ছিলেন তাঁর স্বপ্নও সার্থক হবে। আমাদের জ্ঞানের সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে।

তৃতীয়, সাহিত্য সংস্কৃতির জগৎ থেকে সংবাদপত্রের কর্তৃত্ব খর্ব করতে হবে, মুনাফার প্রাধান্যকে উপড়ে ফেলতে হবে। ব্যাবসার সঙ্গে সাহিত্যের বেসাতি চলতে প

ারে না। সাহিত্য সম্পর্কে শেষ কথা বলবে সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীরা বিশেষ সংবাদপত্রগোষ্ঠীর পোষিত ভাড়াটে সাহিত্যিকরা নয় যারা তাদের পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছে তারা কোনক্রমে নয়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com